দৈনিক খবর
তারিখ 18 APR 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভিখারী মায়ের আত্মহত্যা এবং উচ্চ শিক্ষিত বেকারদের সমস্যা

● সামসুল আনোয়ার মানিক ●

'শিক্ষিত পুত্রের চাকরি না হওয়ায় ভিখারী মায়ের আত্মহত্যা' এই হেডিংয়ে একটি ছোট্ট নিউজ চোখে পড়লো। মাত্র কয়েকদিন আগেই এই দুঃখজনক ঘটনাটি ঘটেছে বাগেরহাটের গুয়াবাড়িয়া গ্রামে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, মা ভিক্ষা করে তার একমাত্র ছেলেকে বিএসসি পাস করিয়ে ঢাকায় পাঠিয়েছিলেন চাকরির সন্ধানে। ছেলে ঢাকা থেকে অনেকদিন পর কোন চাকরি পায়নি, অনেক চেষ্টা করেছে- এইসব খবর জানিয়ে মায়ের কাছে চিঠি পাঠায়। ছেলের এই চিঠি পড়ে দুঃখিনী মা খুবই আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং এই দুঃখের জ্বালা সইতে না পেরে এক পর্যায়ে নিজেই দা দিয়ে নিজের গলা কেটে আত্মহত্যা করেন।

খবরটি ছোট, কিন্তু এর ভাবার্থ বিশাল। বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর অভিব্যক্তি প্রকাশের মত খবর। কারণ, এই ছোট্ট খবরটির মধ্যেই আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সত্যিকারের চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। যেন সমগ্র বাংলাদেশের চেহারাই ফুটে উঠেছে ঐ খবরটিতে। দুঃখিনী বাংলার শাশ্বত রূপ। যে বাংলার ঘরে ঘরে দুঃখ-বেদনা আর হাহাকার। বাঁচার জন্যে মানুষের কি সুকঠিন সংগ্রাম! জন্মাবধি দুঃখ আর দারিদ্র্যের মধ্যেই যার বসবাস। যে অবস্থাকে অভিশাপ জ্ঞানে বর্ণনা করেছেন বাংলারই কোন এক কবি 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ' বলে। যে বাংলার স্বাধীন নাগরিক হিসেবে আমরা নিজেদের পরিচয় দিতে গৌরবান্বিতবোধ করি, সেই বাংলার ঘরে ঘরে যে কত দুঃখী মানুষের অশ্রু ঝরছে প্রতিনিয়ত তার খবর আমরা ক'জন রাখি? দুঃখী মানুষের দুঃখ ঘুচাতে আমরা ক'জনই বা সচেষ্ট হই নিজের ভোগ-বিলাস আর সুখ-সুবিধার কথা ভুলে গিয়ে? বাস্তবে খুব কমই ঘটে এরকম ঘটনা। বিশেষতঃ আমাদের দেশে। কেননা এদেশের ৯০ শতাংশ মানুষই দারিদ্র্যের শিকার। সে হিসেবে অধিকাংশ পরিবারই কম-বেশী সমস্যা দ্বারা আক্রান্ত। এই অবস্থায় 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো'র কথা ভাবাই যায় না। অন্যদিকে বিত্তবান শ্রেণীর লোক যারা আছেন তারা নিজেকে নিয়ে নিজেরা ব্যস্ত। ক্ষমতা থাকলেও গরীব-দুঃখী মানুষের জন্য কিছু করার মানসিকতা তাদের নেই। সেজন্যেই দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে উপায়ন্তর না দেখে এক সময় ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিতে হয় বাধ্য হয়ে। কথিত ছেলেটির মাও সম্ভবতঃ সে কারণেই ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়েছিলেন। স্বামীকে হারিয়ে অন্য দশজন গরীব মহিলার ভাগ্যে যা ঘটে, তার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম কিছু ঘটেনি। সন্তানদের নিয়ে কি করবে, কোথায় দাঁড়াবে- এইসব চিন্তা-ভাবনায় কূল-কিনারা না পেয়েই সম্ভবতঃ ভিক্ষাবৃত্তির মত অবমাননাকর পেশা তাকে গ্রহণ করতে হয়েছিলো। কিন্তু ভিক্ষা করলেও তো সে মানুষ। মানুষ মাত্রেই যেমন বাঁচার আকংখা থাকে, স্বপ্ন থাকে, আশা থাকে- তেমনি তারও হয়তোবা ছিলো বুকভরা আশা এবং স্বপ্ন। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন তার ছেলে একদিন বড় হবে এবং মানুষ হবে। সেই আশা এবং স্বপ্নই তাকে প্রচন্ডভাবে আন্দোলিত করেছিলো। যার দরুন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে জমানো পয়সা দিয়ে তিনি নিজের ছেলের লেখাপড়ার খরচ যুগিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, ছেলে উচ্চ শিক্ষিত হয়ে চাকরি নেবে, সংসারের অভাব-অনটন দূর হবে এবং মানুষের দ্বারে দ্বারে আর ভিক্ষার জন্যে হাত পাততে হবে না। কাজ আর সহায়-সম্পদ থাকলে কে ঐ ঘৃণ্য পেশায় পা বাড়াতে যায়! আশায় বুক বেঁধে তাই বহু কষ্টে ছেলেকে বিএসসি পর্যন্ত পড়িয়েছিলেন। ছেলে যখন বিএসসি পাস করলো তখন কতই না আনন্দিত হয়েছিলেন তিনি! ভেবেছিলেন, দুঃখের তিমির রাত এই বুঝি শেষ হতে যাচ্ছে।

কিন্তু কথায় আছে 'অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকিয়ে যায়।' তার ক্ষেত্রেও ঘটলো ঠিক তাই। বিএসসি পাস করে ছেলে ঢাকায় আসলো চাকরির সন্ধানে। মা তার আশায় বুক বেঁধে আছেন ছেলে চাকরি পাবে। কারণ, এতদিন তিনি এই বিশ্বাসই মনে মনে লালন করে এসেছেন যে, লেখাপড়া করলে চাকরি হয়। হয়তো সেই প্রবাদের কথাও তার অজানা ছিলো না 'লেখাপড়া করে যে গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে।' এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি ছেলেকে ডিগ্রী পর্যন্ত পড়িয়েছেন। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। ছেলে রাজধানীতে এসে অনেক চেষ্টার পরেও একটা চাকরি জুটাতে পারলো না। তার এই ব্যর্থতার কথা সে মাকে চিঠি লিখে যখন জানালো তখন স্বপ্নভঙ্গ হলো, আজীবন লালিত বিশ্বাসের ওপর আঁচড় লাগলো। নিজেকে সংবরণ করার মত ধৈর্যও তার ছিল না। তাই চরম হতাশায় জীবন সংগ্রামে পরাজয়ের গ্লানি সইতে না পেরে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথই বেছে নিতে হলো তাকে।

এই বিয়োগান্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে আমাদের দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্যজনিত অসহায় অবস্থার দিকই কেবল ফুটে উঠেনি, সেইসাথে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার একটা নগ্ন রূপও ফুটে উঠেছে। সরকারের পক্ষ থেকে প্রায়শঃই দাবী করা হয় যে, তারা শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়ার নীতিতে বিশ্বাসী এবং সেই লক্ষ্যে তারা কাজও করছেন। কিন্তু বাস্তবে যখন দেখতে পাই, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে হাজার হাজার ছেলে চাকরির জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে, অথচ তাদের চাকরি হচ্ছে না- তখন সরকারের সেই দাবী মিথ্যা পরিহাসে পরিণত হয় না-কি? সবাই স্বীকার করবেন বেকার সমস্যা আজ দু'একজন বা গুটিকতক লোকের সমস্যা নয়। এই সমস্যা আজ লাখ লাখ মানুষের। বিশেষ করে শিক্ষিত লোকদের জন্যে বেকার সমস্যা এক মহা বিড়ম্বনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত তারা গায়েগতরে খেটে হলেও কোন না কোনভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। আর কিছু না হোক, মুটে-মজুরের কাজটাও অন্ততঃ জুটাতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষিত তরুণদের অবস্থা 'না ঘরকা না ঘাটকা'র মত। দিনমজুরের কাজ নেয়াও যেমন তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না, তেমনি সম্মানজনক চাকরিও তাদের জন্যে এক রকম দুর্লভ বস্তু। তবু উপায় নেই, চাকরির প্রত্যাশা নিয়েই তাদের কাটাতে হয় বহুকাল। চাকরি তাদের জন্যে এক বড় রকমের লটারী। কেননা পদ থাকে একটি তো দরখাস্ত পড়ে এক হাজার। ক্ষেত্রবিশেষে তারও বেশী। অতএব একে লটারী ছাড়া আর কিইবা বলা যায়। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়েও এই লটারীর খেলা খেলতে হচ্ছে আজ উচ্চ শিক্ষিত তরুণদের। সেই লটারীও বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে এখন। কারণ, যতই দিন যাচ্ছে ততই কর্মসংস্থানের সুবিধা সংকুচিত হয়ে পড়ছে। এদিকে উচ্চ শিক্ষিত তরুণদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এই শিক্ষিত তরুণদের চাকরিতে নিয়োগের জন্যে সরকারের তরফ থেকে তেমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না বলে উচ্চ শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক সদ্য পেশকৃত বার্ষিক রিপোর্টের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সম্প্রতি জাতীয় সংসদে পেশকৃত উক্ত রিপোর্টে উচ্চ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগ বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়েছে, দেশে ক্রমবর্ধমান উচ্চ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি অদূর ভবিষ্যতে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিরাট হুমকির সৃষ্টি করতে পারে। রিপোর্টে ৬ বছরের বাৎসরিক শূন্য পদের তুলনায় আবেদনকারীর সংখ্যার আশংকাজনক বৃদ্ধিকে 'জাতির জন্যে ভাবনার বিষয়' বলে মন্তব্য করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ১৯৮৫ সালে যেখানে মাত্র ২৭ জন উচ্চ শিক্ষিত বেকার আবেদন করেছিলেন, সেখানে প্রতি বছরই প্রার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে এবং সেই অনুপাতে শূন্য পদের সংখ্যা বৃদ্ধি না পেয়ে কমে যাওয়াতে ১৯৯১ সালে একটি শূন্য পদের জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৪ জন-এ। উল্লেখ্য, তার পূর্ববর্তী বছর এই সংখ্যা ছিলো ১৫১ জন।

বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের উপরোক্ত বার্ষিক রিপোর্টই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় শিক্ষিত বেকারদের কি নিদারুণ অবস্থা! অর্থাৎ যারা কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে আসছেন তাদের চাকরির কোন গ্যারান্টি নেই। সরকারী খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ দিন দিনই সংকুচিত হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে বেসরকারী খাতেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে বেকার সমস্যা যেমন মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, তেমনি হতাশাও দানা বাঁধছে শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে। এই হতাশা থেকে জন্ম নিচ্ছে ক্ষোভ এবং বিদ্রোহ যা আমাদের দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অস্থিরতার একটা বড় কারণ। দেশব্যাপী আইন-শৃঙ্খলার যে অবনতি পরিলক্ষিত হচ্ছে তার জন্যে অনেকাংশেই দায়ী দেশের এই ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা। শিক্ষা হচ্ছে জাতীয় উত্তরণের প্রধান বাহন। এজন্যে সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই শিক্ষাকে সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। উচ্চ শিক্ষাকে দেয়া হয় বিশেষ মর্যাদা। কেননা যারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন তারা জনগণের সবচেয়ে মেধাবী অংশ। রাষ্ট্র পরিচালনায় যোগ্য নেতৃত্ব গঠনের জন্যে মেধাবী জনশক্তির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। সেই বিবেচনায় সরকারের হাতে এমন পরিকল্পনা থাকা উচিত যার মাধ্যমে প্রতিটি উচ্চ শিক্ষিত তরুণই শিক্ষা জীবন শেষে সহজেই কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারে এবং স্ব স্ব অবস্থানে থেকে দেশ গঠনে কাংখিত অবদান রাখতে পারে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সবচাইতে মেধাবী এই অংশকে রাষ্ট্রীয় কাজে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারছি না। একজন ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনিয়ার নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে বেরিয়ে যদি জনগণের সেবায় নিজেদের নিয়োজিতই না করতে পারলো তাহলে কি লাভ তার শিক্ষার? শিক্ষাকে যখন আমরা মর্যাদা দিচ্ছি, তখন শিক্ষিতদেরও মর্যাদা দেবার প্রশ্নটি এসে যায়। আর সেই মর্যাদা দানের প্রধান পূর্ব শর্ত হচ্ছে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে সম্মানজনক চাকরিতে নিয়োগ করা। চাকরি নেই বা পদ নেই বললে হবে না। চাকরি সৃষ্টি করতে হবে। কেননা আমরা মনে করি, তরুণদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদের বেকারত্বের মুখে ঠেলে দেয়া রাষ্ট্রীয় অপরাধ। রাষ্ট্র যেমন প্রতিটি মানুষের ভাত-কাপড়ের সংস্থান করতে সাংবিধানিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তেমনি শিক্ষিতদের জন্য কর্মসংস্থানের দায়িত্বও রাষ্ট্র এড়াতে পারে না। এ দায়িত্ব এড়ালে রাষ্ট্রেরই ক্ষতি হয়। অন্যদিকে ছেলে-মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা দিতে গিয়ে মা-বাবা তথা অভিভাবকদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। বহু অর্থ ব্যয় করতে হয় তাদের পেছনে। শুধু তাই নয়, সরকারও ছাত্রদের লেখাপড়ার পেছনে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকেন। কয়েক বছর আগের এক তথ্য থেকে জানা যায়, বছরে ছাত্রপিছু সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ মাধ্যমিক স্তরে- ১১২৮ টাকা, মাদ্রাসায়- ৪৩২৭ টাকা, কলেজে- ১৫২৭ টাকা, প্রকৌশল কলেজে- ৬৯৪৪ টাকা, বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২০৫৫ টাকা এবং ক্যাডেট কলেজে ১৩৭৭২ টাকা। ছাত্রপিছু সরকারী ব্যয়ের এই পরিমাণ থেকেই বোঝা যায়, প্রতি বছর উচ্চ শিক্ষার জন্যে সরকার কত বিপুল অর্থ ব্যয় করছেন। অন্যদিকে অভিভাবক যাদের অধিকাংশই দরিদ্র তাদেরও ছেলে-মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা দিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। কোন কোন অভিভাবককে জমিজিরাত বিক্রি করে পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া করাতে দেখা যায়। অনেক অভিভাবক সন্তানদের লেখাপড়ার জন্যে ভিক্ষা করতেও লজ্জা বোধ করেন না। যেমন বাগেরহাটের সেই ভিখারী মায়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তার হয়তো কোন সহায়সম্পদ ছিলো না। কিন্তু নিঃস্ব হলেও তার সন্তানকে নিয়ে তিনি বড় স্বপ্ন দেখতেন। সেজন্যেই ভিক্ষা করে পয়সা জুটিয়ে ছেলেকে তিনি বিএসসি পাস করিয়েছিলেন। এরকম ঘটনা কতই না ঘটছে আমাদের সমাজে। কত কষ্ট করেই না অভিভাবকরা লেখাপড়া করাচ্ছেন সন্তানদের। সেই সন্তান উচ্চ শিক্ষা নিয়ে যখন কাজ না পেয়ে ঘরে বসে থাকে, তখন সে দুঃখ লুকোবার আর জায়গা থাকে না অভিভাবকদের। অনেক অভিভাবক আছেন যারা সন্তানদের লেখাপড়ার পেছনে সব খুইয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন ছেলের আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে। অর্থাৎ তারা চান লেখাপড়া শেষ করেই যাতে তাদের সন্তানরা কোন না কোন কাজে লেগে যায় এবং আয়-উপার্জন করে সংসারের ব্যয় নির্বাহে সাহায্য করে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিভাবকদের সেই আশা পূরণ হয় না। কারণ, চাকরি বস্তুটি বর্তমান জামানায় সবচেয়ে দুর্লভ আমাদের দেশে। এজন্যে ছাত্র সমাজের মাঝে যেমন ক্ষোভ আর অসন্তোষের অন্ত নেই, তেমনি অভিভাবকরাও অত্যন্ত হতাশ। এই হতাশাজনক অবস্থা থেকে শিক্ষাবিমুখতাও একদিন জাতিকে গ্রাস করতে পারে। অন্যদিকে শিক্ষিত তরুণ গোষ্ঠীকে সদ্ব্যবহার করতে না পারার ফলশ্রুতিতে মেধার অপচয়জনিত কারণে রাষ্ট্রের অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে। এমনিতেই শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তির সদ্ব্যবহারকল্পে বাস্তব কোন উদ্যোগ না থাকায় মেধা পাচারের প্রবণতা বাড়ছে। এটা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। অতএব, দেশের শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তিকে রাষ্ট্রীয় কল্যাণে নিয়োজিত করার ব্যাপারে অবশ্যই বাস্তব ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা থাকা দরকার। আর সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রথমেই উচ্চ শিক্ষিত বেকারদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেয়া জরুরী। অনেক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে চাকরি বা আয়-উপার্জনের পথ না হওয়া পর্যন্ত বেকারদের বেকার ভাতা দেয়ার বিধান রয়েছে। আমাদের দেশে সেই ব্যবস্থাও নেই। শিক্ষিত তরুণ বেকাররা ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে কিছু করবে সেই সুযোগও তাদের দেয়া হচ্ছে না। আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পের মাধ্যমে সেই ধরনের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। দেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ সাধনের মধ্য দিয়েও শিক্ষিত বেকারদের জন্য কর্মসংস্থানের পথ সুগম করা যেতে পারে। এ ছাড়া আরো বহু উপায়ে শিক্ষিত বেকারদের কাজে লাগানো সম্ভব। এজন্যেই সম্ভব যে, তারা সংখ্যায় খুব একটা বেশী নয়। আসলে বেকার সমস্যাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে তেমন আমল না দেয়ার কারণেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যে সরকার ক্ষমতায় আসে সেই সরকারই শুধু লম্বা লম্বা কথা বলেই খালাস। বেকার সমস্যা লাঘবের জন্যে 'হেন কারেঙ্গা তেন কারেঙ্গা' ইত্যাদি অনেক কথাই বলা হয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে সরকারী চাকরির বয়সসীমা ২৭ বছর থেকে ৩০ বছর নির্ধারণ করে এমন একটা ভাব দেখাচ্ছেন যেন বেকারদের সব সমস্যার সুরাহা হয়ে গেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, চাকরি বা পদ যদি না থাকে তাহলে বয়স বাড়িয়ে কি লাভ।

চাকরি থাকলেইতো কেবল বয়সের প্রশ্ন। তাই সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, শাক দিয়ে মাছ না ঢেকে বেকার সমস্যার প্রকৃত সমাধান খুঁজে বের করুন। বেকার সমস্যার সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত দেশের দারিদ্র্য দূর হবে না। কারণ, আমাদের দারিদ্র্যের জন্যে বেকার সমস্যা বহুলাংশে দায়ী- একথা আমরা অস্বীকার করি কেমনকরে।